মাছচাষে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

ডঃ মোহাঃ আখতার হোসেন

খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান, আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষিত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ কৌশলসমূহের প্রয়োগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সফলভাবে সম্পন্ন হলেও সমগ্র দেশে তা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি। ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদার প্রেক্ষিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সকল ধরনের জলাশয়ের সঠিক ব্যবহার এবং সকল শ্রেণীর সুফলভোগীর মাছচাষে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বাস্তবে মাছ চাষের উপযোগী বহুমালিকানাযুক্ত পুকুরসমূহ ও সমন্বিত চাষের উপযোগী ধানক্ষেতসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। অন্যদিকে চরম দরিদ্র বা অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মাছচাষে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত কৌশলেরও অভাব রয়েছে- যা বর্তমান ও ভবিষ্যতে মাছচাষের উন্নয়ন ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি সমস্যা।

দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অথবা অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসী অন্যতম। বাংলাদেশে কমপক্ষে ৪৫টি উপজাতির প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ আদিবাসীর বসবাস যা এদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য হলেও পৃথিবীর অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। সঠিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশলের অভাবে এদের জীবন আজ বিপন্ন। মাছচাষের উপযোগী গৃহস্থালি পুকুর, উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণপূর্বক বহুমালিকানা/বর্গাপ্রথার অন্তর্ভুক্ত ধানের জমি এবং পুকুরসমূহে মাছ চাষের মাধ্যমে আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। মূলত এ উপলব্ধি থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার, বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ফোরাম এবং কারিতাসের সহায়তায় সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসীকেন্দ্রিক বেশ কিছু গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। পুকুর ও ধানক্ষেতে মাছচাষভিত্তিক যে গবেষণা পরিচালিত হয় তার উদ্দেশ্যসমূহ: বহুমালিকানা/বর্গাপ্রথার অধীন পুকুরে/ধানক্ষেতে আদিবাসীদের জন্য মাছচাষের কৌশল নির্ণয়, মাছচাষের বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের পারদর্শিতা মূল্যায়ন এবং মাছচাষের ফলে আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের জীবনমানের কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা নির্ণয় করা। এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (পীরগঞ্জ উপজেলা, রংপুর এবং পাঁচবিবি উপজেলা, জয়পুরহাট) পুকুর ও ধানক্ষেতে আদিবাসীদের মাছচাষের উপর এক বছরব্যাপী (সেপ্টেম্বর ২০০৭- আগস্ট ২০০৮ পর্যন্ত) যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তা সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা হলো।

গবেষণা পদ্ধতিঃ গবেষণার জন্য পীরগঞ্জ এবং পাঁচবিবি উভয় উপজেলা থেকে ৩৬টি করে মোট ৭২টি আদিবাসী হাউজহোল্ড দৈব নমুনায়ন (র‍্যানডম স্যামপ্লিং)-এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। গবেষণার মোট ৩০টি পুকুর (পীরগঞ্জে ১৪টি, পাঁচবিবিতে ১৬টি) ও ৪২টি ধানক্ষেত (পীরগঞ্জে ২২টি ও পাঁচবিবিতে ২০টি) অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরেজমিনে পরিদর্শন ছাড়াও প্রশ্নমালাভিত্তিক সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন-একত্রিত ছিল এই গবেষণায় তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি।

নির্বাচিত আদিবাসীদের আর্থসামাজিক অবস্থাঃ পীরগঞ্জে ১০০% আদিবাসী ওঁরাও সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পাঁচবিবিতে চার ধরনের আদিবাসী (ওঁরাও, ৪৪.৪%; সাঁওতাল, ২২.২%, মাহাতো, ১৬.৭% ও পাহান, ১৬.৭%) সদস্য ছিল যাঁদের নিজস্বভূমির পরিমাণ ছিল ০.৫১ হতে ০.৫৭ হেক্টর। সদস্যদের প্রধান পেশা কৃষি (পীরগঞ্জ, ৯৪.৪% ও পাঁচবিবি, ৭৫.০%) এবং পীরগঞ্জে ১১.১১% ও পাঁচবিবিতে ২.৭৮% ব্যতীত অধিকাংশ সদস্যদের মাছ চাষের কোন পূর্ব প্রশিক্ষণ ছিল না। এসকল পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের (৮৩.৩৩-৯৪.৪৪%) প্রধান সঙ্কট ছিলো খাদ্য সঙ্কট।

নির্বাচিত পুকুর ও ধানক্ষেতের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ পুকুর ও ধানক্ষেতসমূহের গড় আয়তন ছিল যথাক্রমে ০.০৫ হেক্টর ও ০.১১ হেক্টর। অধিকাংশ পুকুরই ছিল মৌসুমী প্রকৃতির ও ধানক্ষেতসমূহে পানির প্রধান উৎস ছিল গভীর নলকূপ। পীরগঞ্জে নির্বাচিত পুকুরের সবগুলোই ছিল একক মালিকানা বিশিষ্ট অন্যদিকে পাঁচবিবিতে একক ও বহুমালিকানা বিশিষ্ট পুকুর ছিল যথাক্রমে ৬২.৫% ও ৩৭.৫%। ধানক্ষেতের ক্ষেত্রে একক মালিকানা ছাড়াও বহুমালিকানা ছিল পীরগঞ্জে ২২.৭৩% ও পাঁচবিবিতে ১৫%।

ডঃ মোহাঃ আখতার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ও সভাপতি, ফিসারিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উভয় উপজেলায় ধানক্ষেতের ক্ষেত্রে বর্গাচাষী ছিল প্রায় ৫%। উল্লেখ্য যে, একক খরচ পূর্বে পীরগঞ্জে ৩৫.৭১% এবং পাঁচবিবিতে ২৫% পুকুরে এবং পীরগঞ্জে ৮১.৮২% এবং পাঁচবিবিতে ১০০% ধানক্ষেতে কোন মাছচাষ কার্যক্রম ছিল না।

চাষ প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ কৌশলঃ পুকুরের ক্ষেত্রে শুধু বড় মাছ উৎপাদনের জন্য মিশ্রচাষ এবং ধানক্ষেতের ক্ষেত্রে আঙ্গুলে পোনা ও বড় মাছ উৎপাদনের জন্য একক ও মিশ্রচাষ উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যেক উপজেলা থেকে ৬টি করে মোট ১২টি কৃষক মাঠ স্কুল (Farmers' Field School)-এর মাধ্যমে আদিবাসীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে করে আদিবাসীরা পুকুর/ক্ষেত প্রস্তুতি থেকে শুরু করে সফলভাবে মাছ মজুদ ও পালন করতে সক্ষম হয়। প্রায় ২৫-৪৫ জন আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা সদস্য নিয়ে প্রতিটি কৃষক মাঠ স্কুল গঠন করা হয়।

ফলাফল

বহুমালিকানা/বর্গাচাষের ক্ষেত্রে খরচ ও উৎপাদন বণ্টন কৌশলঃ পুকুরের ক্ষেত্রে দু'ধরনের মালিকানা (একক ও বহুমালিকানা) এবং ধানক্ষেতের ক্ষেত্রে তিন ধরনের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়- একক, বর্গা ও বহুমালিকানা। বহুমালিকানাযুক্ত পুকুরের ক্ষেত্রে মালিকদের মধ্যে একজনকে চাষি হিসেবে নির্ধারণ করা হয় যিনি চাষের ক্ষেত্রে সকল খরচ ও শ্রম দিবেন কিন্তু উৎপাদন বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি মোট উৎপাদন হতে নিজের খরচ বাদ দিয়ে বাকি অংশ সকল মালিকদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করবেন। বহুমালিকানাযুক্ত ধানক্ষেতের ক্ষেত্রে মালিকদের সকলেই সমান শ্রম ও খরচ দিবেন এবং ধান ও উৎপাদনও সমান হারে ভাগ করে নিবেন। বর্গা চাষের ক্ষেত্রে ধান বণ্টনের শর্ত পূর্বের মত থাকলেও অতিরিক্ত ফসল হিসেবে যে মাছ উৎপাদন হবে তার সবটাই চাষি পাবেন। উল্লেখ্য যে, মালিক ও চাষির মধ্যে বিদ্যমান সকল চুক্তি ছিল মৌখিক (১-৩ বছর)।

প্রধান কারিগরি দিকসমূহে পারদর্শিতাঃ পুকুরে মজুদকৃত মাছের মধ্যে কার্প জাতীয় মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, কার্পিও ও গ্রাসকার্প) ছাড়াও ছিল তেলাপিয়া ও থাই সরপুঁটি। পুকুরভেদে ২-৯ ধরনের মাছ মজুদ করা হয় তবে অধিকাংশ (৪২.৭৩%) পুকুরে ৩-৪ প্রজাতির মাছ মজুদ করা হয়েছিল। বড় মাছ উৎপাদনের জন্য পুকুরে মাছের গড় মজুদ ঘনত্ব ছিল হেক্টর প্রতি ২৬,৯০৩টি (পাঁচবিবি) থেকে ৪২,৭৬৭টি (পীরগঞ্জ)। পুকুরে মাছের অতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্য সার হিসেবে গৃহস্থালিতে প্রাপ্ত গোবর (৮৯.২১% ক্ষেত্রে) ও ক্রয়কৃত ইউরিয়া সার (৪৭.৪৫% ক্ষেত্রে); সম্পূরক খাবার হিসেবে চাষিরা বাড়িতে প্রাপ্ত ধানের কুঁড়া (৫২.২৮%) ও উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে (২৬.১৪%) ক্রয়কৃত সরিষার খৈল ব্যবহার করেছে। উল্লেখ্য যে, ১০.৮০% পুকুরে কোন প্রকার সার বা সম্পূরক খাবার ব্যবহার করা হয়নি এবং পুকুরে মাছচাষিদের মধ্যে ১৬.৭২% আদিবাসী পুকুরপাড়ে সবজিচাষ করেছে। পুকুরের ন্যায় ধানক্ষেতেও মজুদকৃত মাছের মধ্যে ছিল কার্প জাতীয় মাছ, তেলাপিয়া ও থাই সরপুঁটি। সর্বোচ্চ ৪৪.২৫% ধানক্ষেতে শুধুমাত্র কার্পও মজুদ করা হয়েছিল। ধানক্ষেতে পোনা উৎপাদনের জন্য গড় মজুদ ঘনত্ব ছিল হেক্টর প্রতি ১,৬২২টি (পাঁচ বিবি) থেকে ৩৩,৭১০টি (পীরগঞ্জ) এবং বড় মাছ উৎপাদনের জন্য গড় মজুদ ঘনত্ব ছিল হেক্টর প্রতি ১৬,৯১৬টি (পাঁচবিবি) থেকে ৩৩,৭১৫টি (পীরগঞ্জ)। ধানক্ষেতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সারসমূহ হলো- গোবর (৪৬.২৩% ক্ষেত্রে) ও ইউরিয়া (১৪.৯৭% ক্ষেত্রে) এবং ব্যবহৃত সম্পূরক খাদ্যসমূহ হলো- বাড়িতে প্রাপ্ত ধানের কুঁড়া (৪৫.৩২% ক্ষেত্রে) ও ক্রয়কৃত সরিষার খৈল (১০.৪৩% ক্ষেত্রে)। উল্লেখ্য যে, ৩৮.১০% ধানক্ষেতে কোন প্রকার সার বা সম্পূরক খাবার ব্যবহার করা হয়নি এবং ধানক্ষেতের পাড়ে ১৪.৩২% আদিবাসী সবজিচাষ করেছে। ধানক্ষেতে মাছের সাথে চাষকৃত ধানের সবগুলোই ছিল 'ব্রি' জাত এবং প্রধান জাতটি ছিল 'হীরা'। পুকুরে মাছের গড় উৎপাদন ছিল ১২২১.৫৫ কেজি/হেক্টর। গড় উৎপাদন খরচ ছিল ৩৩৩৫৮.৭৫ টাকা/হেক্টর ও হেক্টর প্রতি মুনাফা ছিল ৬০৬৬৯.০৭ টাকা। ধানক্ষেতে মাছ ও ধানের গড় উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২৮৯.৯০ ও ৫১১০.৫৪ কেজি/হেক্টর। ধানের উৎপাদন তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্বের তুলনায় ৫০.৩৫% ক্ষেত্রে ধানের উৎপাদনের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, ৩৪.৮২% ক্ষেত্রে উৎপাদান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৪.৫৯% জমিতে ধানের উৎপাদন কম হয়েছে। এক্ষেত্রে ধান ও মাছের গড় উৎপাদন খরচ ছিল ৫২২১৮.৩৮ টাকা/হেক্টর এবং হেক্টর প্রতি মুনাফা ছিল ৭০৫১৫.৩৫ টাকা। উল্লেখ্য যে, বহুমালিকানাযুক্ত পুকুর ও ধানক্ষেতের তুলনায় বর্গাচাষি ধানক্ষেতে মাছচাষে বেশি মুনাফা অর্জন করেছে।

জীবনমানে পরিবর্তনঃ পীরগঞ্জ ও পাঁচবিবির অধিকাংশ আদিবাসী সদস্যের (৯৮.৬১%) মাছ চাষের প্রতি ধনাত্মক ধারণা জন্মেছে যারা প্রকল্প শেষ হবার পরেও মাছ চাষ চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন, মাছ ও শাকসবজি উৎপাদন ও ভক্ষণ, পরিবারের আয় বৃদ্ধি এবং বসতবাড়ির উন্নয়ন ঘটেছে (সারণি ১)।

সারণি ১ঃ পুকুর ও ধানক্ষেতে মাছচাষের ফলে আদিবাসীদের জীবনমানে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ

পরিবর্তনের ধরন	পীরগঞ্জ, রংপুর (%)	পাঁচবিবি, জয়পুরহাট (%)	গড় (%)
ভবিষ্যতে মাছচাষ চালিয়ে যেতে আগ্রহী	৯৭.২২	১০০.০	৯৮.৬১
গৃহস্থালির শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি	৩০.৫৬	৫২.৭৮	৪১.৬৭
পরিবারে মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ বৃদ্ধি	১৩.৮৯	১৬.৬৭	১৫.২৮
খাদ্য হিসেবে শাকসবজি গ্রহণ বৃদ্ধি	৩০.৫৬	৫২.৭৮	৪১.৬৭
পরিবারের আয় বৃদ্ধি	১৬.৬৭	১৬.৬৭	১৬.৬৭
বসতবাড়ির উন্নয়ন	০৫.৫৬	০০.০০	০২.৭৮

মাছচাষের সমস্যাসমূহঃ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে মাছচাষের বেশকিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো- কাঙ্ক্ষিত সময়ে মজুদের জন্য পোনা প্রাপ্তির অভাব, বসতবাড়ি হতে দূরবর্তী পুকুর ও ধানক্ষেতে মজুদকৃত পোনা চুরি, পানি সরবরাহ ঠিকমত না থাকায় বিশেষ করে ধানক্ষেতে পোনা মৃত্যুহার বেশি ছিল, সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার কম হওয়ায় মাছের বৃদ্ধি কম ও বহুমালিকানা বিশিষ্ট পুকুর ও ধানক্ষেতের ক্ষেত্রে দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে মাছের উৎপাদন কম হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ (১) আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে পুকুর এবং ধানক্ষেতে মাছচাষ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম (প্রথমবারের মত মাছচাষের অভিজ্ঞতায় উৎপাদন ও আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি না হলেও ৯৮.৬১% আদিবাসী প্রকল্প শেষ হবার পরও মাছচাষ চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে)। (২) আদিবাসীদের মত দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মাছচাষে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষক মাঠ স্কুল একটি কার্যকর সম্প্রসারণ কৌশল যার মাধ্যমে এই প্রকল্পে ৯০% পুকুর এবং ধানক্ষেতে মাছচাষের জন্য পোনা মজুদ সম্ভব হয়েছে। (৩) বহুমালিকানা/বর্গাচাষের ক্ষেত্রে মালিক এবং চাষির মধ্যে চুক্তি বা খরচ-উৎপাদন বণ্টন কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে স্বল্পমেয়াদী চুক্তি আদিবাসীদের মাছচাষ ব্যবস্থাপনাকে দুর্বল করেছে।

আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে মাছচাষ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কৃষক মাঠ স্কুলকে শক্তিশালীকরণ এবং মালিক ও চাষির মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে পুকুর ও ধানক্ষেতে মাছচাষ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে মৌসুমী পুকুর ও সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আদিবাসীদের জন্য উপযোগী স্বল্পব্যয়ী ও পরিবেশবান্ধব মৎস্যচাষ প্রযুক্তি উন্নয়নে ভবিষ্যত গবেষণারও প্রয়োজন রয়েছে।